International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-III, May 2019, Page No. 13-19
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i3.2019.13-19

মায়ানমারের রোহিঙ্গা : সমস্যা ও সমাধান

ড. শিবুকান্ত বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, মডার্ণ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এ্যাণ্ড লিটেরারি স্টাডিস ডিপার্টমেন্ট, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি

Abstract

Myanmar is predominantly a Buddhist country. Rohinghyas are situated in the western part of the country. Arakan is one of the districts of Myanmar in the northern part which is inhabited by Rohinghyas. Rohinghyas constitutes minority of around 8 lakh people among the majority of Buddhist. Rohinghyas believe in Islam which brought them at the target of Buddhist people of the country. However religion is the prime reason of the dispute between both the religious groups. Myanmar was also one of the colonies of British colonialism like India and South Africa. Myanmar also liberated from the colonial rule one year later India attained freedom in 1947 whereas Myanmar got freedom in 1948. It has been around 70 years of Myanmar's independence from British rule but Rohinghyas have not been provided citizenship so far. Because of which they are deprived of basic constitutional rights. They are subjugated, exploited, suppressed and marginalized. Basic amenities like food, shelter, medical facilities and education are inaccessible by Rohingyas Muslims. Law and order is the primary concern for their survival since at any point of time they have to face atrocities meted out to them by Buddhist. They are brutally killed, women are raped, and sexualy assaults are quite common. Many human rights activists have tried to address their concern internationally however no proper majors have been taken so far. Rohingyans have to face acute poverty and deprivation which force them to encroach to the neighboring countries like Bangladesh and India only to safeguard their families.

This research article attempts to explore the historicity of Rohinghyas. Rohinghyas's problems have been discussed from socio-political, cultural, economic and religious point of views.

পৃথিবীর সমস্ত জীব জগতের মধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমান প্রাণি হল মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত পশু, পাখি, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই দাসত্বে পরিনত করেছে। অন্য বস্তু বা প্রাণিকে বশ করার পালার যখন সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে তখন শুরু হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা। কে কাকে দাসত্বে পরিণত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমান করবে এই হয় মানব জাতীর একমাত্র লক্ষ্য। শুরু হয় হিংসা, রাহামারি, একের সঙ্গে অপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিসরে নিজস্ব বিষয় সম্পত্তির লড়াই ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে মানব জাতীর মধ্যে। এই প্রেক্ষিতেই শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সুস্থ জীবন-যাপন, দু:খ-কষ্ট থেকে মুক্তির জন্য সর্বজনীন সত্য হিসেবে আবির্ভূত হয় ধর্মের। আনুমানিক আজ

থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগে ধর্মের প্রচলন শুরু হয় বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে। ধীরে ধীরে খ্রিষ্ট ধর্ম, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তন হয়। তবে সব ধর্মের উদ্দেশ্য দু:খ-দুর্দশা, খুন, গ্লানি, স্বার্থপরতা প্রভৃতি জীবন যাপনের অনুপযোগি বিষয় থেকে মানব জাতিকে মুক্তি। অতীতে যে ধর্মের নির্মাণ হয় মানব জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য সে ধর্মই হয়েছে আজ বিশ্ব মানব জাতির অস্তিত্বের সংকট। যে মানব জাতিকে রক্ষার জন্য ধর্মের সৃষ্টি হয় সে ধর্মই হয়েছে আজ মানব জাতির পরম শত্রু। কোনো এক সময় ধর্মের জন্যই রাজনীতির আবির্ভাব হয়েছে বর্তমানে রাজনীতির জন্য ধর্মের প্রয়োগ করা হচ্ছে গোটা বিশ্ব জুড়ে। এই রূপের আংশিক চিত্র লক্ষ্য করা যায় বর্তমান এসিয়া মহাদেশের ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ এবং মায়ানমারের জাতীয় ইতিহাসে। ধর্মীয় রাজনীতির রক্তে-কলুষিত হয়ে আছে উদ্ধৃত রাষ্ট্র গুলির ইতিহাস। কিন্তু বর্তমানে এই কয়েকটি রাষ্ট্রের মধ্যে সব থেকে বড় বেদনা দায়ক ঘটনার উদ্ভব দেখা দিয়েছে মায়ানমারের রাখাইন অঞ্চল বা আরাকানে। হ্যাঁ এই সেই আরাকান যে আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল, যাদের চর্চা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতের প্রায় সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়। যে রাজ্যে কবি শিল্পীদের প্রতিভার বিচ্ছুরণে সর্বদা পুস্পবৃষ্টি ঝরে পড়ত প্রসংসায়। সে আরাকান আজ বিশ্বের ইতিহাসে রোহিঙ্গা হত্যার গ্লানিতে জর্জরিত, কলুষিত, ক্লেদাক্ত, বিষন্নতা ও লজ্জার বিষয়।

মায়ানমার দেশটির পূর্ব নাম ছিল বার্মা। এখানকার প্রাচীন অধিবাসী তিব্বতীয় বার্মান ভাষাভাষি জনগোষ্ঠী। এবং এদের ধর্ম হলো বৌদ্ধ। নবম থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত এই রাষ্ট্রের ভাঙা-গোড়ার খেলা জারি থাকে। এবং এই সময়ই মায়ানমার এসিয়া মহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে স্বাক্ষর রাষ্ট্রে পরিনত হয়। এ্যংলো বর্মী যুদ্ধের ফল স্বরূপ বার্মায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি নির্ভর এই বৃহৎ রাষ্ট্রের বৃহৎ ক্ষমতার ভাঙন ধরাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীতে বিভেদ সৃষ্টি করে। আর এই বিভেদের ফল স্বরূপ একই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিণ জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় গৃহ যুদ্ধ। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়কাল থেকে এখনো পর্যন্ত এই গৃহ যুদ্ধের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

রোহিঙ্গা মায়ানমারের কয়েকটি ক্ষুদ্রতম জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি। "তাদের সবাই সুদূর অতীতে বার্মার বাইরে থেকে এসেছে। রোহিঙ্গারা তেমনি একটি ক্ষুদ্র জাতি যারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী। আনুমানিক ৬০০ বছর আগে রোহিঙ্গারা পূর্ব-বাংলা থেকে আরাকান রাজ্যে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। নরমেখলা নামের এক আরাকান রাজা রাজ্য হারিয়ে বাংলার সুলতান জালালুদ্দিন শাহের আশ্রয় নেন। ১৪৩০ সালে বাংলার সুলতান তাকে তার রাজ্য পুনরোদ্ধারে সাহায্য করেন। বাংলাদেশ থেকে তার এই অভিযানে সাহায্য করার জন্য যাদেরকে তিনি নিয়ে যান তারাই পরবর্তীতে রোহিঙ্গা নামে পরিচিতি হন।"[১]

আবার "১৯৪৬ সালে যখন ভারত ও পাকিস্তান ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল তখন আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিম নেতারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। পাকিস্তানের মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মত আলী জিন্নাহ আরাকানের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা পাকিস্তানের সাথে একিভূত করতে আগ্রহ দেখাননি।"[২]

পাকিস্তানের অস্বীকৃতি যেন রোহিঙ্গা মুসলিমদের জীবন পরিনতির একটি অন্যতম বড় কারন। যদিও বার্মা বা মায়ানমারের স্বাধীনতার সঙ্গে রোহিঙ্গার জীবন গাথার কোনো সম্পর্ক নেই। কারন ৪৮-এর পূর্ববর্তী সময় থেকেই রোহিঙ্গা নির্যাতন অব্যাহত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর এই নির্যাতন যেন দ্বিগুন বেড়ে যায়। ১৯৪৮ সালে 'ইউনিয়ন অফ বার্মা'র যে 'ইউনিয়ন চুক্তি' স্বাক্ষর হয় তাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কোনো উল্লেখ থাকে না। ফলে এঁদের স্বার্থ অধিকার ও সাংবিধানিক সুরক্ষার সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ব্রিটিশ ও মায়ানমার উভয়ই যৌথভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের সঙ্গে প্রতারণা করে। অথচ এই রোহিঙ্গা মুসলিমরাও বিগত ৬০০ বছর ধরে বসবাস করে আসছে বার্মার আরাকান অঞ্চলে। দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করে আসা প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ রাতা-রাতি

নাগরিকত্বকে হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে নিজের পরিচয়। যেহেতু সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই তাই বৈষম্যমূলক আচরণ চরমে উঠতে থাকে।

নে উইন ১৯৬২ সালে বার্মার সেনানায়ক জেনারেল পদ গ্রহণ করে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত দেশ শাসন করে। 'তিনি এবং তাঁর রাজনৈতিক দল রোহিঙ্গা মুসলমানদের নির্যাতন ও বিতারণের পলিসি গ্রহন করে। তারা তাদের চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে ধীরে ধীরে সকল নাগরিক অধিকার হরণ করতে শুরু করে। রোহিঙ্গা মুসলমানদের সকল ধরণের সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও এদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। কেবল অধিকার হরণ নয়, রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তাদের ভিটেছাড়া করার অব্যাহত প্রচেষ্টা চলতে থাকে। নানারকম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন-নির্যাতন আর অপকৌশলের শিকার হয় তারা।'[৩]

নে উইন সরকার ১৯৭৮ সালে 'ড্রাগন অপারেশন' শুরু করে। বাহ্যিক উদ্দেশ্য অন্য থাকলেও এই অপারেশনের আভ্যন্তরিন উদ্দেশ্য ছিল রোহিঙ্গা উচ্ছেদ। সামরিক-আধাসামরিক-বেসামরিক প্রভৃতি সমস্ত বাহিনীই নিরস্ত্র রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে হত্যা করে। শুরু করে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ও গনধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ক্রিয়াকলাপ। ধ্বংস করে সমস্ত মসজিদ ও কিছু সংখ্যক হিন্দু মন্দিরও। প্রায় দশ হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা করে মায়ানমারের মানুষিকতা হীন অমানুষেরা। এরই প্রেক্ষিতে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সকলেই প্রান বাঁচানোর তাগিদে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়ে আসে বাংলা দেশে। বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমের সহযোগিতায় নিন্দার ঝর উঠে নে উইনের নামে, মায়ানমারের প্রশাসনের প্রশাসনিক পদ্ধতির প্রতি সন্ধিহান হয় গোটাবিশ্ব। এই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ সমস্ত রোহিঙ্গাদের পুনরায় মায়ানমারে ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু নে উইনের রাজনৈতিক দলের সেরকম কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। অপরদিকে ১৯৮২ সালে বার্মার নাগরিকত্ব আইনে শুধুমাত্র বার্মিজ জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কাউকে নাগরিকত্বের অধিনে নিয়ে আসে না। ফলে পুনরায় রোহিঙ্গারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হয়, বঞ্চিত হয় ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্তি করণ থেকে। নিজ দেশে, নিজ রাজ্যে বসবাস করেও রোহিঙ্গারা হয় পরবাসী। ১৯৯২ সালের গোড়ার দিকে পুনরায় শুরু হয় রোহিঙ্গা নির্যাতনের পালা। চলতে থাকে অত্যাচার, নির্যাতন, খুন ও ধর্ষণ যা সহ্য করতে না পেরে আবার রাতের অন্ধকারে পালিয়ে আসে বাংলাদেশে। এই সময় প্রায় আড়াই লক্ষ্যেরও অধিক হিন্দু-মুসলমান রোহিঙ্গা বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই নেয়। আবার শুরু হয় মিয়ানমারে রোহিঙ্গা ফিরিয়ে নেওয়ার চুক্তিপত্রের মিথ্যে অভিনয়। আবার ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হয় বাংলাদেশে রোহিঙ্গা পালিয়ে আসার ঢল। এই সময়ে নির্যাতন, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার দস্যুত্ব ও পশুত্ব প্রবৃত্তি এবং হত্যাকাণ্ডের রূপ এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে সর্বমোট প্রায় পাঁচ লক্ষ নারী-পরুষ-শিশু বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্বাস্তু হিসেবে ঠাঁই নেয়। সিরাজ উদ্দিন সাথী তাঁর 'রোহিঙ্গার বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থে রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের সময়রেখাকে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়েছেন এভাবে,

'সময়কাল	**ঘটনা**
১৭৮৪	বার্মার অধীনে বার্মিজ রাজা বুদাওয়াপা আরাকান দখল করে রোহিঙ্গা মুসলমান ও রাখাইন উভয় সম্প্রদায়ের অধিবাসীর উপর নির্যাতন চালান। অনেকে পালিয়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামে চলে আসেন।
১৮২৮	বার্মা ইংরেজদের উপনিবেশে পরিনত হয়।
১৯৩৭	ব্রিটিশ ভারত থেকে আলাদা করা হয়। বৌদ্ধদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য রোহিঙ্গা মুসলমান নিহত হয়।
১৯৪৭-৭৮	ভারতবর্ষ দুই দেশে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনতা পায়। আরাকানি রোহিঙ্গারা পাকিস্তানে যোগ দিতে চায়। ব্রিটিশরা তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদার আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত বার্মার অন্তর্ভুক্ত করে।
১৯৬২	জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল। বর্মি স্টাইলের সমাজতন্ত্র ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ।

১৯৬৩	রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের আবির্ভাব। সরকারি দমন।
১৯৭৫	আরাকানসহ বার্মায় সরকারবিরোধী গেরিলা লড়াই। সরকারী দমন নীতি। পনের হাজার রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।
১৯৭৭	সামরিক জান্তা কর্তৃক 'নাগামিন' বা ড্রাগন কিং অপারেশন পরিচালনা।
১৯৭৮	সামরিক জান্তা ও বৌদ্ধ সহিংসতার কারনে প্রাণ বাঁচাতে প্রায় ৩ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। বার্মা সরকার রোহিঙ্গাবিরোধী নীতিগ্রহণ করে।
১৯৮২	মায়ানমার নাগরিকত্ব আইন পাস করে রোহিঙ্গাদের অনাগরিকে পর্যবসিত করা হয়। তাদের অধিকার বঞ্চিত করা হয়।
১৯৯১	সেনা বাহিনীর অভিযানে নির্যাতিত হয়ে ২ লাক্ষ ৫০ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা মাতৃভূমি ছেড়ে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হয়।
১৯৯২-২০০৪	জাতি সংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে চলে আসা রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো হয়। কিছু শরনার্থী শিবিরে অপেক্ষায় থাকে।
২০০৫	মায়ানমার (সাবেক বার্মা) সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে অবশিষ্ট রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে অস্বীকার করে।
২০১২	মায়ানমার সেনা বাহিনী রোহিঙ্গা নির্যাতনের নতুন অধ্যায় শুরু করে। নিপীড়িন, নির্যাতন, ধর্ষন ও খুনের মতো নিষ্ঠুরতা বৌদ্ধদের উসকে দেয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু আশিন উঠরাথা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নেতৃত্ব দেয়। -রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আসতে চাইলে বাংলাদেশ সরকার তাদের পুশব্যাক করে। এ সময় অসংখ্য রোহিঙ্গার প্রাণহানি ঘটে।
২০১৪	মংডু ও সিত্তে শহরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোশকতায় রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে নৃশংস সংহিতা পরিচালিত হয়।
২০১৫	জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যমূলক আচরণ অব্যাহত থাকার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে।
২০১৭	সামরিক বাহিনী নির্বিচারে রোহিঙ্গাদের হত্যা, ধর্ষণ, গনধর্ষণ, নির্যাতন এবং তাদেরর ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে মাতৃভূমি থেকে চিরতরে বিতাড়নের অভিযান চালায়। অভূতপূর্ব মাত্রায় গণহত্যা চালায়। বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয় দশ লক্ষাধিক অসহায় রোহিঙ্গা।'

এবার প্রশ্ন হলো কেনো রোহিঙ্গারা বার বার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে উদ্বাস্তু হয়ে আসছে। কেনই বা শোষণ, নির্যাতন, ধর্ষণের মতো নোংরা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে রোহিঙ্গা অঞ্চলের মানুষেরা। এই প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দিতে চাইলে বলতে হয় ধর্মের কথা! হ্যাঁ ধর্মই হচ্ছে রোহিঙ্গাদের জীবন বিনষ্টের মূল কারন। সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক কারন। মায়ানমার সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মের গ্যারাকলে পরিচালিত হয়ে আসছে সুদূর অতীত কাল থেকে। আজও এই ধর্মের প্রভাব এতটাই প্রবল যে গোটা রাষ্ট্র শক্তিকে এই ধর্মাবলম্বী মানুষেরাই পরিচালিত করছে ধর্মের অজুহাতে। 'হাজার বছরেও তারা ধরে রেখেছে তাদের পূর্বপুরুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও সাংস্কৃতিক সামাজিক ধারা। বর্ণবাদী বিষয়ের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয় একত্রে কাজ করেছে। মুসলমানদের প্রতি এক ধরণের বিতৃষ্ণা ও বিরাগ বিরাজ করছে উগ্র বৌদ্ধদের মাঝে। তারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে তাদের দেখছে। বার্মার সামরিক-বেসামরিক শাসকরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দুই ভাগের মধ্যে তারা সকলেই 'থেরাবাদ' অংশের। তারা থেরাবাদী বৌদ্ধ। এমন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট থেকে তারা বার্মা তথা বর্তমান মায়ানমারের রাষ্ট্র ও সমাজকে তাদের নিজের ঢংয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে বহুকাল ধরে। একনায়কসুলভ কর্তৃত্ববাদী শাসনে তারা এটা করছে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায়।'[৪]

সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে শুধুমাত্র ধর্মীয় কারনেই মায়ানমারের স্থায়ী আধিবাসীদের কাছে রোহিঙ্গারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়। যখন খুশি তাদের হত্যা করা যায়, যৌন নির্যাতন করা যায় রোহিঙ্গা নারীদের, করা যায় ধর্ষণ ও গনধর্ষণের মতো পশুত্ব আচরণ। কারন রোহিঙ্গাদের ধর্ষণ বা গনধর্ষণ অথবা নির্যাতনের কোনো বিচার হয় না মায়ানমারে। সমস্ত অন্যায় অত্যাচারকে মুকমুজে সহ্য করতে হয় রোহিঙ্গা পুরুষদেরকেও। 'পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের নারীদের রক্ষা করতে পারছে না। নিজ পরিবারের নারীসদস্যদের আব্রু সুরক্ষিত করার দায়িত্ব পালন করা তো দূরের কথা, এক্ষেত্রে তারাও হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে। ন্যক্কারজনকভাবে তারা পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্য ও শিশুদের সামনে প্রকাশ্যে ধর্ষিত হচ্ছে। শিশু ও কিশোরীরাও অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণ ও উচ্ছৃঙ্খল যৌনতার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা ধর্ষিত হচ্ছে নাসাকা বাহিনীর দ্বারা। গনধর্ষণের শিকার সামরিক বাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক। গনধর্ষণ যেন তাদের অভিযানের অপরিহার্য অংশ। তারা নির্বিচারে ধর্ষিত হচ্ছে বেসামরিক রাখাইনদের দ্বারা। এ এক নৈরাজ্যকর ধর্ষণের মুল্লুক রোহিঙ্গাদের কাছে। এ যেন এক জাহান্নামের মুল্লুক। মগের মুল্লুক।'[৫]

এছাড়াও রয়েছে রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশুকে দাসত্বে পরিণত করার কাহিনি। ইতিহাসের কয়েকটি ঘৃণ্যতম প্রথার মধ্যে একটি হল দাসপ্রথা। এই প্রথা বিলুপ্তির আপ্রান চেষ্টা চলছে গোটা বিশ্বজুড়ে অথচ রোহিঙ্গারা খানিকটা ভিন্ন ভাবে হলেও এই প্রথারই শিকার। জোরজবরদস্তি রোহিঙ্গাদের ধরে নিয়ে গিয়ে শ্রমে নিযুক্ত করছে মায়ানমার সরকার। হাড় ভাঙা পরিশ্রম করছে বটে কিন্তু তার যথাযথ মূল্য থেকে হয়েছে বঞ্চিত। স্বাভাবিক কারনে তারা তাদের উপার্জনের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারনে পরিবারে দেখা দেয় চরম অভাব। এদের মধ্যে কেই কেই অদক্ষ শ্রমিক কোনো রকমে তাদের পারিশ্রমিকের টাকায় চালায় তাদের দৈন্যন্দিন সংসার। বিনা মজুরিতে কাজ করায় এদের পরিবারে নেমে আসে সীমাহীন দারিদ্র। অবাক করার বিষয় এই অত্যাচার শুধুমাত্র রোহিঙ্গাদের জন্যই প্রযোজ্য। অন্যকোনো জাতিগোষ্ঠীকে এই শ্রম দিতে হয় না। সার্থক হচ্ছে মায়ানমারের প্রকল্প শ্রম দিচ্ছে রোহিঙ্গা। উপরন্তু নির্বিচারে চলে নির্যাতন-হত্যা-ধর্ষণ-গণধর্ষণ। বিনা অপরাধে রোহিঙ্গা শ্রমিক মজুর কৃষককে বন্দিশালায় বন্দি করে চলতে থাকে অত্যাচার। এক কথায় রোহিঙ্গারা মায়ানমারের চোখে সম্পূর্ণ মানুষ নয় পশুর চেয়েও নীচে। রোহিঙ্গাদের বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থে সিরাজ উদ্দিন সাথী রোহিঙ্গাদের প্রতি হওয়া জোরজবরদোস্তিমূলক কিছু ক্ষেত্রসমূহের উল্লেখ করেছেন।

১. সেনাছাউনি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
২. সড়ক নির্মাণ ও ররক্ষণাবেক্ষণ।
৩. গ্যাসের পাইপলাইন স্থাপন।
৪. নাসাকা বাহিনীর বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৫. সেনাছাউনিতে জ্বালানি কাঠের সরবরাহ।
৬. মডেল ভিলেজ তৈরির সরকারি প্রকল্প।
৭. পানিয় সরবরাহ।
৮. ইট তৈরি।
৯. রাত্রিকালীন পাহারাদার।

ধর্মীয় ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক শোষণ ছারাও রোহিঙ্গাদের বঞ্চিত করা হত তাদের জন্য বরাদ্ধ অর্থ থেকেও। সেকারনেই শুধু ধর্ম বা জাতি বিদ্বেষের আঙ্গিক থেকে না দেখে অর্থনৈতিক দিকটিও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, '২০০৯ সালে নার্গিস ঝরে মিয়ানমারে ১ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সে দেশের প্রয়োজন ছিল ৬৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকার জনগনের পাশে না দাঁড়িয়ে ৬৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে ২০টি মিগ-২৯ ও এম আই ৩৫ এটাকিং হেলিকপ্টার কিনেছে। এই বিপুল পরিমান অর্থ যুগিয়েছে ইয়াদানা গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস। যেটি রাখাইন রাজ্যের কাছাকাছি সমুদ্র

থেকে উত্তোলন করে এই রাজ্যের উপর দিয়েই পাইপ লাইন নিয়ে চীনে পাঠানো হয়েছে। বার্মায় সে সময় সামরিক শাসন ছিল। জেনারেলরা প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রির সমস্ত টাকাই মিলিটারি অস্ত্র বা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে বিদেশে পাচার করেছেন। দেশটি দিন দিন গরীব থেকে গরীব হয়েছে। আরাকান অঞ্চলে ৭৮% লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে।'[৬]

আরাকান অঞ্চলটি বিভিন্ন রকম মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা। বিশেষ করে গ্যাসের খনি রয়েছে এই অঞ্চলে, রয়েছে তেলের খনি। এখানকার পুকুর, নদী, লেক, পথঘাট প্রাকৃতিক ভাবেই সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত। আভ্যন্তরিন বানিজ্যের জন্য এই স্থান মায়ানমারের বিশেষ স্থান রূপে চিহ্নিত হয়েছে। সমুদ্র সংলগ্ন হওয়ায় আন্তর্জাতিক বানিজ্যের ক্ষেত্রেও এই স্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া কৃষি কাজের জন্য এই স্থান ভ্রূপরিসীম সম্ভাবনাময়। তাই মায়ানমারের কাছে এই স্থান স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে ওঠে পাখির চোখ। এবং মায়ানমার সরকার যখন বুঝতে পারে যে প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য মোটা অঙ্কের টাকা এই রাজ্যের জন্য বরাদ্ধ করতে হবে। টাকা তো দূরের কথা এখানকার অধিবাসীদেরকেই উচ্ছেদের কাজে লেগে পরে মায়ানমার সরকার। অথচ এই অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতির খরচ এই সব গ্যাস কোম্পানিরই প্রদান করার কথা। এসবের তো বালাই নেই উপরন্তু গ্যাস উত্তোলনের জন্য যে জমির দরকার, সে জমিও রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে দখল করে গ্যাস উত্তোলনের কাজ করা হয় কিন্তু জমির কোনো রকম ক্ষতিপুরণ দেওয়া হয় না। ২০১২ সালে এই জমির পরিমান ছিল ৩১ লক্ষ একর। জমি রাখাইন অঞ্চলের রোহিঙ্গাদের অথচ জমির মালিক মায়ানমার সরকার। শ্রম দেয় রোহিঙ্গা শ্রমের অর্থ পায় মায়ানমার। এভাবেই বংশ পরম্পরা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্রে চলতে থাকে রোহিঙ্গাদের দাসত্ব জীবন।

একের পর এক কোনো না কোনো ভাবে মায়ানমারের রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে আসছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এর মূল কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে মায়ানমার সরকারের শোষণ, শাসন, দমনপীড়ন নীতি, হত্যা, ধর্ষণ, কর্পোরেশন, এবং রাজনীতি। সঙ্গে রয়েছে ধর্মীয় দমনপীড়ন নীতির বিধ্বংসী গ্যাড়াকল ও শ্রেণিগত বৈষম্য। এখনো অগনিত আরাকান রোহিঙ্গা মুসলমান পরিবার ভারত ও বাংলাদেশের আশ্রিতা। তবে কী এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই! নিশ্চয় আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো সমস্যা নেই যে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রয়োজন শুধু সাম্যবাদী দৃষ্টিকোনের, দরদ ও মানবিকতার। রোহিঙ্গাদেরকে তাদের নিজভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই হবে এই সমস্যার মূল সমাধান। সঙ্গে তাদের নাগরিকত্ব, নিরাপত্তা ও সম্মানের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে কেউ কাউকে হত্যা করে বড় হতে পারে না। তাছাড়া আরাকানের প্রকৃতি যেমন মায়ানমারের সম্পদ সেখানকার নাগরিকও মায়ানমারের সম্পদ এই ভাবনায় ভাবিত হতে হবে। এর জন্য জাতিসংঘকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সমস্যা সমাধানের পরবর্তীতে যাতে পুনরায় এই সমস্যা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে ধ্যান রাখতে হবে। মায়ানমারের বৌদ্ধ ও রোহিঙ্গা মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই ধর্ম ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে মনুষ্যত্বের বিকশিত করতে হবে। ভাতৃত্বের বন্ধনে মানবিক আবেদনে আবদ্ধ থাকতে হবে, তবেই হবে মায়ানমার রাষ্ট্রে উন্নতি, ফিরবে শান্তি।

তথ্যসূত্র:

১. ২০১৬-১২-০৭ তারিখে খোলা কলম, ফেরদৌস হাসান, দৈনিক প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর ২০১৬।
২. ২০১৬-১২-০৭ তারিখে সহজিয়া করচা, মকসুদ সৈয়দ আবুল, দৈনিক প্রথম আলো ৩০ নভেম্বর ২০১৬।
৩. রোহিঙ্গাদের বিষাদ-সিন্ধু, সিরাজউদ্দিন সাথী, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।
৪. রোহিঙ্গাদের বিষাদ-সিন্ধু, সিরাজ উদ্দিন সাথী, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।
৫. রোহিঙ্গাদের বিষাদ-সিন্ধু, সিরাজউদ্দিন সাথী, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।
৬. রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারন, কলম চোর এর বাংলা ব্লগ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বিকাল ৫:৫৮।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. Chan Aye: The Development of a Muslim Enclave in Arakan State of Burma, SOAS, 2018
২. Ghose, Jamini Mohan: Maghs Raider in Bengal, Bookland Private Ltd. Calcutta, 1960.
৩. Mahalla Gaskin: The politics of Identity in Myanmar: The Rohingyas, Kachin & Wa ethnic minoritrries, ADLAIDE University, 2017.
৪. Siddiqui, Habib : The Forgottten Ruhinga : Their Struggle for Human Right in Burma, Kindle, Japan 2007.
৫. The Daily Financial Express: Rohinga Free Village in Rakhain, Published in Dhaka, 3 October 2017.
৬. The National: Tale of rape, torture & arson, Published in UAE, 25 November 2017.
৭. দৈনিক প্রথম আলো, ৩১ আগস্ট, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭।
৮. দৈনিক মানব জমিন, ১১, ১৬ অক্টোবর ২০১৭।
৯. বার্ট্রান্ড, রাসেল এ্যাণ্ড অনুবাদ- কঙ্কর সিংহ : কেন আমি ধর্মবিরোধী, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১০০০, মার্চ ২০১৫।
১০. রানা, এস এম : রোহিঙ্গা নিপীড়িত ভূমিপুত্র, অ্যাডার্ন পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ২০১৯।
১১. রোহিঙ্গা সমস্যার মূল কারন, কলম চোর এর বাংলা ব্লগ, ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ বিকাল ৫:৫৮।
১২. সাথী, সিরাজ উদ্দিন : রোহিঙ্গাদের বিষাদ সিন্ধু, অ্যাডার্ন পাবলিকেশন, ঢাকা-১০০০, ফেব্রুয়ারি ২০১৯।